গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

মহাভারত আশ্রয়ী বাংলা নাটক : ১৮৫২-১৯১২

পৌরাণিক আখ্যান উপাখ্যানগুলি বহুকাল ধরে কথিত বা গীত হয়ে আসছে কথক ঠাকুর বা গায়েনের মাধ্যমে, আর সাহিত্যিক উপস্থাপন করছেন গল্প-উপন্যাসে, কাব্য-নাট্য-সমালোচনায়। কথক বা গায়েন যখন আখ্যানাদি উপস্থাপন করেন তখন তাঁদের নিজস্ব রঙ-ঢঙ-সঙ যেমন মিশিয়ে দেন, সাহিত্যিকও একই রকম বচন-কথন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর মতো করে উপস্থাপন করে থাকেন। নাট্যকারদের সমাজভাবনা, রাজনৈতিক চেতনা, শিক্ষা-রুচি ও জীবনদর্শনের ছায়া এসে পড়ে তাঁদের রচিত নাটকে। তখন পৌরাণিক চরিত্রগুলির রূপান্তর ঘটে, স্বর্গের বা দেবদেবীর কাহিনির রূপকে বর্তমান যুগের সমস্যা-সঙ্কট চিন্তাভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। পুরাণ কাহিনিকে ভেঙে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান কবি সাহিত্যিক নাট্যকাররা।

মধ্যযুগের যাত্রাপালা বা গীতাভিনয়ে কাহিনির একটা খসড়া থাকে, গানই সেখানে মুখ্য বিষয়। সংযোগ স্থাপনের জন্যে কিছু কিছু সংলাপের সাহায্যে কাহিনি-সূত্র ধরে দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু নাটকে অঙ্ক দৃশ্যে বিভাজিত সুবিন্যস্ত প্লট নির্মাণের জন্য কাহিনির অন্বেষণে পুরাণ তথা মহাকাব্যকে আশ্রয় করেছেন প্রথম পর্বের নাট্যকাররা। বাংলা পৌরাণিক নাটকের কালপর্বে রামায়ণের মতোই মহাভারতের আখ্যানও নাট্যকাহিনির আকরিক স্তরে প্লট নির্মাণে বহু বিচিত্র ঘটনার উপাদান সরবরাহ করেছে।

প্রথম অধ্যায় : তারাচরণ শীকদার

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে বাংলায় মৌলিক নাটক লিখিত না হলেও বহু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হয়েছিল। তারাচরণ শীকদার প্রথম প্রয়াসেই সংস্কৃতের বন্ধন ছিন্ন করে

পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গীককে গ্রহণের সাহসিকতা দেখিয়েছেন ‘ভদ্রার্জুন’ (১৮৫২) নাটকে। প্রচলিত যাত্রার গীত-অভিনয়ের যুগে নাটক রচনা করেও তিনি সঙ্গীত প্রায় পরিহার করেছেন। বাংলা ভাষায় অভিনয়োপযোগী নাটক রচনার উদ্দেশ্যেই তিনি কলম ধারণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে বাংলা নাটকের আঙ্গিক পাশ্চাত্য ধারায় লালিত হওয়ার পথপ্রদর্শক তারাচরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : হরচন্দ্র ঘোষ

ডিরোজিও শিষ্য হরচন্দ্র ঘোষ বাংলায় নাটক রচনার পূর্বে শেক্সপিয়রের নাটকের অনুবাদ করলেও প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হননি। তাঁর নাটকে পাশ্চাত্য নাট্যবৈশিষ্ট্যানুযায়ী পঞ্চাঙ্ক বিভাজন এবং সংস্কৃত নাটকের নান্দী, সূত্রধার ইত্যাদি নাটকের কায়া নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ভব যুগের এই নাট্যকার বাংলা পৌরণিক নাটকের মিলনান্তক পরিণতির শর্ত লঙ্ঘন করেছেন। হরচন্দ্র ঘোষ কাহিনির বৈদেশিকতাকে বাংলা নাটকের প্রতিকূল ভেবে নিয়ে স্বদেশি কাহিনির অন্বেষণে আশ্রয় করেছেন মহাভারত।

তৃতীয় অধ্যায় : রামনারায়ণ তর্করত্ন

রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সংস্কৃত নাটকের চরিত্রগুলিকে অপেক্ষাকৃত সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও কোন কোন চরিত্রে বাস্তবরস সঞ্চারে সফল হয়েছেন। মহাভারতের কাহিনি অনুসরণে মৌলিক নাটক ‘রুক্মিণীহরণ’ (১৮৭১) রচনার পূর্বে সংস্কৃত নাট্যকার ভট্টনারায়ণ ও কালিদাসের ‘বেণীসংহার’ (১৮৫৬) ও ‘অভিজ্ঞান শকুন্তল’ (১৮৬০) নাটকের অনুবাদ করেন। মহাভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই তিনটি নাটক রচনার মধ্য দিয়ে পুরাণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ব্যক্ত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : মধুসূদন দত্ত

মহাভারতের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে মধুসূদন যেমন ‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯) নাটক রচনা করেছেন, তেমনি তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যের এগারটি পত্রের মধ্যে নয়টিরই নায়িকা মহাভারতের চরিত্র। বস্তুত কাব্য, নাটক এবং সনেটে মধুসূদন যে সব পুরাণকে উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে মহাভারত অন্যতম। পাশ্চাত্য নারীবাদী আনন্দোলনের প্রভাবে তাঁর সৃষ্ট দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে অতিক্রম করে গেছে। বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারদের মধ্যে খুব কম জনই পেরেছেন নিজেদের নাটকে পুরাণ কথাকে এভাবে আধুনিক তাৎপর্যে পুনগঠিত ও সম্প্রসারিত করতে।

পঞ্চম অধ্যায় : মনোমোহন বসু

হিন্দুমেলার অন্যতম কর্ণধার মনোমোহন বসু বাঙালির স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করতে পুরাতনের অনুবর্তন করেছেন। তিনি মহাকাব্যের সুবিশাল পরিধির মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আনুসন্ধান করেছেন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও এই পথেই নিজেদের শিকড় খুঁজে পেয়েছিলেন। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে তিনি ‘সতী নাটক’(১৮৭৩) ও ‘পার্থ পরাজয়’(১৮৭৫) নাটকে ইংরেজি বা সংস্কৃত নাটকের অনুকরণ না করে দেশজ রীতিতে পরিবেশন করেছেন। জাতীয়তাবাদী নাট্যকার পরাধীন যুগে বাঙালির বীরত্ব উজ্জীবনের জন্য মহাভারতের ‘বভ্রুবাহন’ চরিত্রটি বেছে নিয়ে বীর চরিত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্রের মহাভারত আশ্রয়ী নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কেবল ভক্তিরস সঞ্চার এই নাটকগুলির উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যেই পুরাণ কাহিনির নেপথ্যে নাট্যকারের একটি বার্তা রয়েছে। আত্মপরিচয়ের সংকট, সৃষ্টি-ধ্বংসের দ্বন্দ্ব, সময় তত্ত্ব, নারী

ললুপতা, ধনতন্ত্রের অবক্ষয় বা যুদ্ধোন্মাদনা -এ সকল বিষয় নাটকগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে।

মহাভারত কাহিনি অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি হলো- অভিমন্যুবধ (১৮৮১), পান্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮২), দক্ষযজ্ঞ (১৮৮৩) নলদময়ন্তী (১৮৮৩), প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৮৪), শ্রীবৎসচিন্তা (১৮৮৪), জনা (১৮৯৪), পান্ডব গৌরব (১৯০০)। এই নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্র মূলত কাশীরামের আখ্যান অনুসরণ করেছেন।

সপ্তম অধ্যায় : রাজকৃষ্ণ রায় এবং বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

গিরিশচন্দ্রের নাট্যবলয়ের মধ্যে পুরাণ কাহিনি অবলম্বন করে যাঁরা নাটক রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় এবং বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি নিয়ে এ পর্বের নাট্যকারেরা প্রচুর নাটক লিখেছেন। নাট্যঘটনার উপস্থাপনে নাট্যিকক্রিয়ার অত্যধিক তারল্য ও গীতি প্রবণতা এসকল নাটকের অন্যতম লক্ষণ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। রাজকৃষ্ণ রায়ের দুর্বাসার পারণ, ভীষ্মের শরশয্যা, যদুবংশধ্বংস (১৮৮৪), প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৯১) এবং বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর (১৮৮৪), রাজসূয় যজ্ঞ (১৮৮৫), পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (১৮৮৯), সুভদ্রা-হরণ, দুর্যোধন-বধ, পান্ডব নির্বাসন, ভীষ্ম-মহিমা -ইত্যাদি নাটকগুলি মহাভারত আশ্রয়ী নাটকের বিবর্তনের ধারায় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির মধ্যে হৃদয়-সৌন্দর্য দান করেছেন। তিনি মহাভারত কাহিনির কাঠামো মাত্র গ্রহণ করেছেন। মানব হৃদয়ের বিশেষ অনুভূতিগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে কবির কলমে। কর্ণ, কুন্তী, কচ বা চিত্রাঙ্গদা একান্ত ভাবেই রাবীন্দ্রিক। তাঁর কাব্যনাটকের মধ্যে

মর্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। মহাভারত আশ্রয়ী নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাথ অন্যতম সংযোজন। চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯), বিদায়-অভিশাপ (১৩০০), গান্ধারীর আবেদন (১৩০৪), নরকবাস (১৩০৪), কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ (১৩০৬) -এই পাঁচটি কাব্যনাট্য ছাড়াও রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রায় সকল ধারাতেই অনিবার্যভাবে এসেছে মহাভারতের প্রসঙ্গ।

নবম অধ্যায় : ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উনিশশতকের পৌরাণিক নাটকের অহৈতুকী ভক্তিকে অতিক্রম করে বিশশতকে যুক্তিবাদের অন্বেষণ করেছেন যেসকল নাট্যকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি যে অর্থে পৌরাণিক অভিধেয় পরবর্তী কালের নাটকে ঠিক সেই তাৎপর্য অক্ষুন্ন থাকেনি। নাট্যকাররা পুরাণ বা মহাকাব্যকে আশ্রয় করে নাটক রচনা করলেও তাঁদের নাটকে ভক্তিরসের ভাবাবেগ লঙ্ঘিত হয়েছে বা কোথাও কোথাও কৃত্রিম রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

পৌরাণিক নাটক রচনা করতে গিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ মূলত মহাভারত থেকেই চরিত্র নির্বাচন করেছেন। তিনি ‘বভ্রুবাহন’(১৯০০), ‘সাবিত্রী’(১৯০২), ‘উলুপী’(১৯০৬), ‘ভীষ্ম’(১৯১৩) ইত্যাদি নাটকের মধ্যে যে পুরাণ দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, জীবনের অন্তিম পর্বে ‘নরনারায়ণ’(১৯২৬) নাটকে তারই প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হন। দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্ট ভীষ্মকে (১৯১৪) অতিমানবীয় সত্তা ত্যাগ করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রক্তমাংসের মানুষ রূপে মঞ্চে দেখা যায়। নাটকগুলির বিশ্লেষণে মহাভারতীয় চরিত্রের পুনর্নির্মাণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার :

অষ্টাদশ পর্বের সুবিশাল মহাভারতের মূল কাহিনি আশ্রয়ী নাটকের পাশাপাশি উপকাহিনি নির্ভর নাটকের সংখ্যাও কম নয়। আলোচ্য গবেষণার ‘মহাভারত আশ্রয়ী বাংলা নাটক :

১৮৫২-১৯১২’ লক্ষ্য উনিশ শতকে বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন থেকে বিশ শতকে পৌরাণিক নাটকের ঋত্বিক গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিশিষ্ট নাট্যকারদের নাটকে মহাভারতের পুনর্নির্মাণের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য প্রবণতার যে বিবর্তন ঘটেছে তা অনুসন্ধান করা এবং পরবর্তী কালের নাটকে এসকল পৌরাণিক নাটকের প্রভাব কতটা তা আবিষ্কার করা।

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : ‘বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস’ (২ খন্ড), এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

২. উৎপল দত্ত : ‘গিরিশ মানস’, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮

৩. কাশীরাম দাস : ‘মহাভারত’, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৪. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত : ‘মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া’, পুস্তক বিপনি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১৫

৫. তপোধীর ভট্টাচার্য : ‘ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮